মজলিসে দাওয়াতুল হক
কী ও কেন?

মুফতী মনসূরুল হক

মজলিসে দাওয়াতুল হক
কী ও কেন?

সংকলনে

মুফতী মনসূরুল হক

প্রধান মুফতী ও শাইখুল হাদীস
জামি‘আ রাহমানিয়া আরাবিয়া
সাত মসজিদ মাদরাসা
মোহাম্মাদপুর,ঢাকা
আলী অ্যান্ড নূর রিয়েল এস্টেট, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা-১২০৭

বিশিষ্ট খলীফা,
মুহিউস সুন্নাহ হযরত মাওলানা শাহ আবরারুল হক রহ.

দ্বিতীয় সংস্করণ: রজব-১৪৩৭ হিজরী
প্রকাশনা ও পরিবেশনায়

মাকতাবাতুল মানসূর

সর্বস্বত্ব : প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

মূল্য: ৩০ টাকা মাত্র

www.darsemansoor.com
www.islamijindegi.com

সূচিপত্র	পৃষ্ঠা
ভূমিকা	৩
নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাতের গুরুত্ব	৫
মুজাদ্দিদ কাকে বলে	৬
মুজাদ্দিদগণ সাধারণত দুই ধরণের সংস্কার কাজ আঞ্জাম দেন	৭
কোন্ সহীহ হাদীস আমলযোগ্য?	৭
সকল মুহাদ্দিস ও মুফাসসির মাযহাব পন্থী ছিলেন	৮
যাদের কিতাবের ভিত্তিতে হাদীস সহীহ-যঈফ	৯
লা-মাযহাবী বন্ধুগণ কি দীনের জরুরী কিতাবসমূহ	১১
মাইয়িতকে জলদী দাফন করা সুন্নাত	১২
সওয়াব রেসানীর খতমের বিনিময় লেনদেন নাজায়েয	১৩
হাফেয সাহেবদের বিশ্বাস রাখতে হবে	১৪
দ্রুততম সময়ের মধ্যে মীরাস বণ্টন করা	১৫
আখেরী উম্মতের মুজাদ্দিদ কারা?	১৬
হযরত থানবী রহ. ছিলেন ১৪ শতাব্দির মুজাদ্দিদ	১৭
হযরত থানবী রহ. এর অবদান	১৮
হযরত থানবী রহ. কেন দাওয়াতুল হক শুরু করলেন	১৯
হযরত থানবী রহ.এর গবেষণা ও অনুসন্ধানের ফলাফল	১৯
সাহাবায়ে কেরাম কেন সত্যের মাপকাঠি?	২০
মওদুদী সাহেবের মারাত্মক ভুল	২০
ঈমানের গুরুত্ব	২১
হারদুয়ী গিয়ে যা পেলাম	২২
নামাযে হাত উঠানো ও পা রাখার সুন্নাত তরীকা	২৩
মুনাজাত শুরু ও শেষ করার সুন্নাত তরীকা	২৩
হযরত থানবী রহ. উম্মতের তিন নম্বর সমস্যা দেখলেন	২৫
কয়েকটি কবীরা গুনাহ	২৫
মসজিদে গুনাহে কবীরার আলোচনা সংবলিত কিতাবের তা'লীম করা জরুরী	২৬
হারামকে হালাল মনে করলে ঈমান থাকে না	২৬
প্রচলিত জমি বন্ধক সুদী লেনদেনের অন্তর্ভুক্ত	২৭
এ প্রসঙ্গে জনৈক আলেমের ঘটনা	২৭
লেনদেন ও বান্দার হকের গুরুত্ব	২৮
মজলিসে দাওয়াতুল হকের ভিত্তিস্থাপন	২৮
ঢাকায় দাওয়াতুল হকের কাজের সূচনা	২৯

করাচী হযরতের ঢাকায় আগমন	৩০
হাফেজ্জী হুযূরের শেষ নির্দেশ	৩০
হারদুয়ী হযরতের বাংলাদেশ সফর জারী হয়ে গেল	৩১
এখন সকল আলেম ও দীনদার লোকদের দায়িত্ব	৩১
তাবলীগী মেহনত থাকতে এ মেহনতের কী প্রয়োজন?	৩২
মাদরাসাগুলোর সমস্যার সমাধান	৩২
রাশিয়া ইলমের মারকায ছিল	৩৩
মুসলিম প্রধান বাংলাদেশ কোন দিকে এগুচ্ছে!	৩৩
অদূর ভবিষ্যতে ধ্বংসাত্মক সমস্যার একমাত্র সমাধান!	৩৪

باسمه تعالی

ভূমিকা

হামদ ও সালাতের পর...

হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী রহ. ছিলেন গত শতাব্দীর মুজাদ্দিদ বা দীনী সংস্কারক। গভীর পর্যবেক্ষণ ও পর্যাপ্ত গবেষণার পর তিনি উম্মতের দীনী যিন্দেগীর কিছু ভুল-ভ্রান্তি চিহ্নিত করেন। অতঃপর সেগুলোর সংশোধনকল্পে এবং উম্মতের দীনী জীবনে পূর্ণতা আনয়নের লক্ষ্যে কয়েকটি কার্যক্রম হাতে নেন। উম্মতের সামনে দলীল-প্রমাণের আলোকে ঈমান, কুফর ও শিরক-বিদআতের পূর্ণাঙ্গ রূপ তুলে ধরা, তাজবীদ অনুযায়ী বিশুদ্ধ কুরআন তিলাওয়াত শিক্ষাদান, সকল আমলের পূর্ণাঙ্গ সুন্নাত তরীকা পেশ করে তার অনুসরণে উদ্বুদ্ধকরণ এবং মুনকারাত তথা হারাম, মাকরূহে তাহরীমী ও নাজায়িয কাজ সম্পর্কে অবহিতকরণ ছিল সেগুলোর অন্যতম। উলামায়ে কেরামের পরামর্শে তিনি এই মুবারক মেহনতের নাম দেন মজলিসে দাওয়াতুল হক। বস্তুত এটি ছিল একটি ইলহামী মেহনত যা আল্লাহ তা‘আলা হযরত থানবীর অন্তরে ঢেলে দিয়েছিলেন। হযরত থানবী রহ.এর জীবদ্দশাতেই তার খোলাফায়ে কেরাম নিজ নিজ অঞ্চলে দাওয়াতুল হকের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। এ ধারাবাহিকতায় আমাদের দেশেও হযরত থানবী রহ.এর এদেশীয় খলীফাবৃন্দ নিজ নিজ সাধ্য অনুযায়ী এই মহান খিদমত আঞ্জাম দিয়ে গেছেন। কিন্তু ব্যাপকভাবে এই মেহনতের সঙ্গে এদেশের উলামায়ে কেরামকে পরিচয় করিয়ে দেয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন হযরত হাফেজ্জী হুযূর রহ.। এক হজ্জের সফরে তিনি হযরত থানবী রহ. এর খলীফা ও নিজ পীরভাই মুহিউস সুন্নাহ শাহ আবরারুল হক হারদুয়ী রহ. এবং হযরত হারদুয়ী রহ. এর খলীফা আরেফ বিল্লাহ হযরত হাকীম মুহাম্মাদ আখতার সাহেব রহ.কে বাংলাদেশে এসে দাওয়াতুল হকের মেহনতকে ব্যাপকতা দানের আবেদন করেন। তার আবেদনের প্রেক্ষিতে উক্ত হযরতদ্বয় এদেশে আগমন করেন। তখন হযরত হাফেজ্জী হুযূর রহ. তার মুরীদানকে এ দু’জনের নিকট বাইয়াত করিয়ে দাওয়াতুল হকের কর্মী হিসেবে তাদের হাতে তুলে দেন। এই দুই হযরতের পৃষ্ঠপোষকতায় বিশেষত হযরতওয়ালা হারদুয়ী রহ.এর প্রত্যক্ষ দিকনির্দেশনায় অল্পদিনের মধ্যেই এদেশের উলামায়ে কেরাম ও জনসাধারণের নিকট দাওয়াতুল হক ব্যাপক পরিচিতি লাভ করে। উলামায়ে কেরাম এ মেহনতকে মনেপ্রাণে আপন করে নেন।

ফলে দেশের আনাচে কানাচে আজ মানুষের মধ্যে সুন্নাত অনুযায়ী দীন পালনের প্রতি কমবেশি যেটুকু আগ্রহই পরিলক্ষিত হচ্ছে, বলা যায় তার সিংহভাগই দাওয়াতুল হকের ফসল। বক্ষ্যমান রেসালাটি দাওয়াতুল হক বিষয়ক একটি বয়ানের লিখিত রূপ। মুহিউস সুন্নাহ হযরত হারদুয়ী রহ.এর মুবারক সুহবত থেকে দাওয়াতুল হক সম্পর্কে আমি যতটুকু অবগতি লাভ করতে সক্ষম হয়েছি তার সারসংক্ষেপ এখানে আলোচনা করা হয়েছে। এতে মজলিসে দাওয়াতুল হকের পরিচয়, উৎপত্তি, কার্যক্রম ও ক্রমবিকাশ তুলে ধরা হয়েছে। আশা করি এর মাধ্যমে উলামায়ে কেরাম ও জনসাধারণ দাওয়াতুল হক সম্পর্কে অবগতি লাভ করতে পারবেন এবং দাওয়াতুল হক বাংলাদেশের মুহিব্বীন ও কর্মীবৃন্দ কাজের পদ্ধতি সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হতে পারবেন। আল্লাহ তা‘আলা এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে ভরপুর কামিয়াব করুন। আমীন।

বিনীত
মনসূরুল হক
২৯-০২-২০১৬ খ্রি.

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

হাকীমুল উম্মত, মুজাদ্দিদুল মিল্লাত, মাওলানা শাহ আশরাফ আলী থানবী রহ.-এর সারা জীবনের অভিজ্ঞতা, চিন্তা-ফিকিরের সারনির্যাস

মজলিসে দাওয়াতুল হক

মুফতী মনসূরুল হক দা.বা.

গত ২৬শে জানুয়ারি বুধবার ২০১৬ ইং রংপুর জুম্মাপাড়া মাদরাসায় মজলিসে দাওয়াতুল হকের মহাসম্মেলনে শাইখুল হাদীস মুফতী মনসূরুল হক দা.বা. প্রদত্ত বয়ান।

হামদ ও সালাতের পর...

উপস্থিত বাংলাদেশ মজলিসে দাওয়াতুল হকের আমীরুল উমারা, মুহিউস সুন্নাহ, শাইখুল হাদীস আল্লামা মাহমুদুল হাসান দামাত বারাকাতুহুম; আমার শাইখ, সায়্যিদ, হাফেয, কারী, মুক্বরী, মাওলানা শাহ আবরারুল হক নাওয়ারাল্লাহু মারকাদাহু-এর খলীফাবৃন্দ; ওয়াজিবুল ইহতেরাম, ওয়ারিসে আম্বিয়া সর্বস্তরের উলামা হাযারাত; কাবেলে ইহতেরাম, আশেক সুন্নাত দীনদার ভাইয়েরা ও সুন্নাতের ধারক-বাহক, প্রাণপ্রিয় তালিবানে ইলম।

আল্লাহ তা'আলার অশেষ মেহেরবানী, তিনি আমাদেরকে কঠিন শৈত্য প্রবাহ উপেক্ষা করে জুম্মাপাড়ার এই দাওরায়ে হাদীস মাদরাসায় দাওয়াতুল হকের মহাসম্মেলনে সুন্নাতের নামের উপর উপস্থিত হওয়ার তাওফীক দান করেছেন। ইনশাআল্লাহ, এই মজলিস হাশরের ময়দানে নবীজীর প্রতি আমাদের অন্তরের ইশক ও মহব্বতের সাক্ষী হবে। নচেৎ দূর-দূরান্ত হতে যাতায়াত ও খানা-পিনার কষ্ট স্বীকার করে আমরা এখানে আসতে পারতাম না। আল্লাহ তা'আলা তাওফীক দিয়েছেন, তার হাবীবের মুহাব্বত অন্তরে ঢেলে দিয়েছেন এ জন্য আমাদের পক্ষে সম্মেলনে আসা সহজ হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা মাহফিলকে ভরপুর কবুল করুন। এর উসিলায় আমাদের পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনকে মাফ করে সকলের হিদায়াতের ফয়সালা করুন।

আমি আপনাদের সামনে দু'টি আয়াতে কারীমা ও দু'টি হাদীস শরীফ তিলাওয়াত করেছি।

নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাতের গুরুত্ব

প্রথম আয়াতে আল্লাহ্ তা‘আলা বলেছেন,

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

অর্থঃরাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাদেরকে যা দেন তা গ্রহণ কর, আর তোমাদেরকে যা থেকে নিষেধ করেন তা হতে বিরত থাক এবং আল্লাহকে ভয় করে চল। নিশ্চয় আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা। (সূরা হাশর- ৭)

দ্বিতীয় আয়াতে আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন,

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

অর্থঃ হে নবী! মানুষকে বলে দিন, তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবেসে থাক, তবে আমার অনুসরণ কর, তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকে ভালোবাসবেন এবং তোমাদের গোনাহসমূহ মাফ করবেন। আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (সূরা আলে ইমরান- ৩১)

হাদীস শরীফে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود كما بدأ فطوبى للغرباء ...

অর্থঃইসলাম তার অভিযাত্রা শুরু করেছে অপরিচিত অবস্থায়। শীঘ্রই তা শুরুর অবস্থায় ফিরে যাবে। তবে গোরাবাদের (অপরিচিত মুসাফির) জন্য সুসংবাদ! যারা আমার ইন্তিকালের পর আমার সুন্নাতের মধ্য হতে মানবসৃষ্ট বিচ্যুতি ও বিকৃতি সংশোধন করে দিবে। (সহীহ মুসলিম; হা.নং ৩৮৯, সুনানে তিরমিযী; হা.নং ২৬২৯, ২৬৩০)

অন্যত্র ইরশাদ করেন,

فانه من يعش منكم بعدى فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين...الخ

অর্থঃ আমার ইন্তিকালের পর তোমরা যারা জীবিত থাকবে তারা অনেক মতবিরোধ দেখতে পাবে। সে সময় তোমাদের কর্তব্য হবে আমার তরীকাকে আঁকড়ে ধরা এবং খুলাফায়ে রাশিদীনের তরীকাকে মজবুত করে ধরা। (সুনানে আবূ দাউদ; হা.নং ৪৬০৭)

মুহতারাম উপস্থিতি! এ মুহূর্তে আমার উদ্দেশ্য একটি বিশেষ মেহনত সম্পর্কে আলোচনা করা। তা হল, মজলিসে দাওয়াতুল হকের কাজ কীভাবে শুরু হল? এবং কীভাবে আমরা এই মহান কাজ লাভ করলাম?

মুজাদ্দিদ কাকে বলে?

হাকীমুল উম্মত, মুজাদ্দিদুল মিল্লাত মাওলানা শাহ আশরাফ আলী থানবী রহ. গত শতাব্দীর মুজাদ্দিদ তথা দীনী সংস্কারক ছিলেন। এই উম্মতের জন্য আল্লাহ তা'আলা প্রতি শতাব্দীতে মুজাদ্দিদ প্রেরণ করেন। বলাবাহুল্য, মুজাদ্দিদ প্রেরণ করা নবী প্রেরণের মতো নয়। অর্থাৎ (আল্লাহর পানাহ) মুজাদ্দিদের কাছে ওহী আসে না। ওহীর দরজা তো কিয়ামত পর্যন্ত সময়ের জন্য বন্ধ হয়ে গেছে। বরং এর অর্থ হল, উম্মতের ব্যাপক ফায়দার জন্য উম্মতেরই কোন বড় আলেমকে আল্লাহ তা'আলা মুজাদ্দিদ বানিয়ে দেন যা তার সংস্কারমূলক কাজকর্ম দেখে অনুধাবন করা যায়। সাধারণ উলামায়ে কেরাম তো মাশাআল্লাহ উম্মতের অনেক ভুল-ভ্রান্তিই ঠিক করে দেন। কিন্তু সময়ের ব্যবধানে উম্মতের মধ্যে এমন কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি সৃষ্টি হয় যেদিকে সাধারণ আলেমদের দৃষ্টি যায় না। এর হেকমত ও রহস্য আল্লাহ তা'আলাই ভাল জানেন। তো ঐ ভুল-ত্রুটিগুলো চিহ্নিত করে তা সংশোধন করার জন্য আল্লাহ তা'আলা প্রতি শতাব্দীতে এক বা একাধিক মুজাদ্দিদ বা সংস্কারক পাঠান। আবূ দাউদ শরীফের এক হাদীসে আছে,

إن الله عز وجل يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها

অর্থঃ নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা এই উম্মতের জন্য প্রতি শতাব্দীতে মুজাদ্দিদ প্রেরণ করেন, যিনি তাদের প্রয়োজনীয় দীনী সংস্কার সাধন করেন। (সুনানে আবূ দাউদ: হা.নং ৪২৯১)

মুজাদ্দিদগণ সাধারণত দুই ধরণের সংস্কার কাজ আঞ্জাম দেন

(ক) দীনের নামে অনেক গলদ বিষয় দীনের মধ্যে প্রবেশ করে। মুজাদ্দিদগণ এগুলোকে স্পষ্ট করে দীন থেকে ছাঁটাই করে দেন। যেমন, ১. উরস শরীফ ২. জশনে জুলুস ৩. মীলাদ-কিয়াম ৪. ঈদে মীলাদুন্নবী। ৫. অনুরূপভাবে কিছু বদনসীব লোকের নবীদের ভুল ধরা ৬. সাহাবায়ে কেরামকে সত্যের মাপকাঠি মনে না করা, তাদের সমালোচনা করা বৈধ মনে করা ৭. ভন্ড নবীর অনুসরণ করা ৮. মাযহাব মানার দরকার নেই; বুখারী শরীফ বগলে রাখলেই দীনের ওপর চলা যাবে এ জাতীয় কথাবার্তা প্রচার করে দীনের মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা ইত্যাদি বিষয়গুলো মূলত দীন বহির্ভূত; কিন্তু দীনের নামে উম্মতের মধ্যে চালু হয়ে গেছে। মুজাদ্দিদগণ এ ধরনের ভুলগুলো চিহ্নিত করে দলীল-প্রমাণের মাধ্যমে সমূলে মিটিয়ে দেন।

উল্লেখ্য, সহীহ বুখারীর দোহাই দিয়ে মাযহাব অস্বীকার করার বিষয়টি কেন ভুল তা বুঝার জন্য একটু ব্যাখ্যা সহকারে পেশ করা হচ্ছে।

সহীহ বুখারীতে এমন অনেক হাদীস আছে যেগুলো রহিত হয়ে গেছে যেমন, ১. সহীহ বুখারীর এক হাদীসে যিলহজ্জ মাসের ১১, ১২ তারিখে রোযা রাখার কথা বলা হয়েছে। (সহীহ বুখারী; হা.নং ১৯৯৬) আবার পরবর্তী এক হাদীসে তা হারাম বলা হয়েছে। (সহীহ বুখারী; হা.নং ১৯৯৭, সুনানে আবূ দাউদ; হা.নং ২৪১৮, সুনানে নাসায়ী; হা.নং ২৮৮৮)

২. এক হাদীসে আছে, তোমার ইমাম যদি বসে নামায পড়ায়, হে মুক্তাদী! তুমিও বসে বসে ইকতেদা করো। (সহীহ বুখারী; হা.নং ৭২২, সহীহ মুসলিম; হা.নং ৪১৭) কিন্তু এই বিধান নবীজীর অন্তিম মুহূর্তে বসে বসে ইমামতি করা আর সাহাবাদের দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ইকতেদা করার দ্বারা রহিত হয়ে গেছে। (সহীহ বুখারী; হা.নং ৭১৪)

৩. ইসলামের শুরুর দিকে নামাযে বারবার হাত তোলার হুকুম ছিল। এটা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. কর্তৃক বর্ণিত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। (সহীহ বুখারী; হা.নং ৭৩৬) কিন্তু যে আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. উক্ত হাদীস বর্ণনা করেছেন সেই তিনিই আরেকটি হাদীসে বর্ণনা করছেন, নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় আসার পর নামাযে একবারের বেশি হাত উঠাতে নিষেধ করেছেন। (আখবারুল ফুকাহা ওয়াল মুহাদ্দিসীন লিলকাইরাওয়ানী) আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযি.-এর বড় মাপের শাগরেদ, বিশিষ্ট মুহাদ্দিস হযরত মুজাহিদ, হযরত আব্দুল আযীয ইবনে হাকিম, হযরত আবুল আলিয়া রহ. প্রমুখ বলেছেন, আমরা আমাদের উস্তাদ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমরের পিছনে কয়েক বছর নামায পড়েছি কিন্তু তাঁকে নামাযে একবারের বেশি হাত উঠাতে দেখিনি। (শরহু মাআনিল আসার; হা.নং ১৩২৩, মুআত্তা ইমাম মুহাম্মাদ; হা.নং ১০৮) কাজেই পরবর্তী দুই হাদীস জানার পর হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. থেকে নামাযে কয়েকবার হাত উঠানোর হাদীস বর্ণনা করা কোন অবস্থায় ঠিক হতে পারে না। কারণ এ হাদীসটি মক্কী যিন্দেগীতে থাকা কালীন তিনি বলেছিলেন। এ জাতীয় অনেক রহিত হাদীস সহীহ বুখারীতে আছে।

৪. স্ত্রীর সঙ্গে পরিপূর্ণ মিলন হয়েছে কিন্তু বীর্যপাত হয়নি, চারও মাযহাব মোতাবেক এদের উভয়ের ওপর গোসল ফরয হবে, যা সহীহ বুখারীর ২৯১নং হাদীসে উল্লেখ আছে। অথচ বুখারী শরীফের দু-দুটি স্থানে আছে,

এদের ওপর গোসল ফরজ হবে না, শুধু উযূ করে নিলেই হবে। (সহীহ বুখারী; হা.নং ২৯২, ২৯৩) পূর্বের হাদীস দ্বারা পরের হাদীসটি রহিত হয়ে গেছে।

কোন্ সহীহ হাদীস আমলযোগ্য?

মোটকথা, এ জাতীয় বিষয়গুলো এক যামানায় ছিলো, পরবর্তীতে ঐ হুকুম রহিত হয়ে গেছে। কারণ দীনে ইসলাম একদিনে বা একবারেই পরিপূর্ণ হয়ে যায়নি; ধীরে ধীরে সুদীর্ঘ তেইশ বছরে তা পূর্ণতায় পৌঁছেছে। ফলে অনেক পুরাতন হুকুম নতুন হুকুম দ্বারা প্রত্যাহার করা হয়েছে। হাদীসের কিতাবের লেখকগণ ইসলামের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস সংরক্ষণের স্বার্থে নতুন-পুরাতন, আগের পরের সকল বিধান সংবলিত হাদীস কিতাবে লিপিবদ্ধ করে দিয়েছেন। সুতরাং হাদীসে থাকলেই এবং বর্ণনাসূত্র সহীহ হলেই সর্বক্ষেত্রে তার ওপর আমল করা যায় না। বরং হাদীসে বর্ণিত বিধানটি নবীজীর সাথে খাস ছিল কিনা? বা উম্মতের জন্য বলে থাকলেও নবীজীর ইন্তিকাল পর্যন্ত তা বহাল ছিল কিনা তা-ও দেখতে হয়। বোঝা গেল, যে হুকুমটি নবীজীর সাথে খাস বা যে হুকুমটি রহিত হয়ে গেছে, বর্ণনাসূত্র সন্দেহাতীত হওয়ার কারণে সেটা সহীহ হাদীস একথা ঠিক এবং তা ইসলামের সঠিক ইতিহাসও বটে; কিন্তু সুন্নাত অর্থাৎ আমলযোগ্য নয় কিছুতেই। বরং এসব হাদীসের উপর আমল করা উম্মতের জন্য নাজায়েয বটে।

একটি সহীহ হাদীস যার উপর আমল করা নাজায়েয। এমন হাদীস সহীহ বুখারীতে অনেক রয়েছে। উদাহরণত একই সময়ে নিজের বিবাহে চারের অধিক স্ত্রী রাখা নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল। একথার বর্ণনা কুরআনে কারীমেও এসেছে এবং নবীজীর সীরাত সংরক্ষণের বৃহত্তর স্বার্থে হাদীস হিসেবে সহীহ বুখারীতেও এসেছে কিন্তু এটাকে সুন্নাত মনে করে কোন মুসলমান এর ওপর আমল করতে পারবে না। কেননা এ বিধান নবীজীর সঙ্গে নির্দিষ্ট। নবীজী ব্যতীত অন্যান্যদের জন্য একই সময়ে নিজের অধীনে চারের অধিক স্ত্রী রাখা জায়িয নেই। সুতরাং যারা বলে বুখারী শরীফ বগলে রাখলে মাযহাব মানার দারকার নাই; তাদেরকে বলা হবে, তাহলে তোমরাও একই সময়ে ৯টি বা ১১টি করে বিয়ে করো। কারণ একই সময়ে নবীজী কর্তৃক ৯ জন বা ১১ জন স্ত্রী রাখার কথা তো সহীহ হাদীসেই আছে। (সহীহ বুখারী; হা.নং ২৮৪) আর তোমরা তো হাদীস মানারই দাবী করে থাকো। বলুন, এ হাদীসের ওপর আমল করা তাদের জন্য জায়িয হবে? হবে না। কারণ এটা হাদীস সত্য; কিন্তু সুন্নাত নয়।

সকল মুহাদ্দিস ও মুফাসসির মাযহাব পন্থী ছিলেন

ইমাম বুখারী রহ. সহীহ বুখারীর কোথাও একথা বলেননি যে, তোমরা আমার এই কিতাব বগলে নিয়ে ঘুরতে থাকো, তোমাদের আর মাযহাব মানা লাগবে না। বরং স্বয়ং ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম, ইমাম তিরমিযীসহ বড় বড় সকল মুহাদ্দিস এবং বড় বড় সকল মুফাসিসর সারা জীবন কোন না কোন মাযহাব মেনে চলতেন। কেউ হানাফী মাযহাব, কেউ শাফেয়ী মাযহাব, কেউ হাম্বলী মাযহাব আবার কেউ মালেকী মাযহাব অনুসরণ করতেন। মাযহাব অনুসরণকারী মুহাদ্দিস ও মুফাসসিরদের একটি বিরাট তালিকা আমি আমার লিখিত কিতাব 'মাযহাব ও তাকলীদ'-এর মধ্যে পেশ করেছি। মাযহাব মানা যদি শিরক হয় তাহলে হে লা-মাযহাবীরা! মাযহাবওয়ালাদের সংকলিত কিতাব দিয়ে তোমরা হাদীসের দলীল পেশ করছো কীভাবে? কারণ মাযহাব মানার কারণে তোমাদের মতে তারা তো মুসলমানই নয়। (নাউযুবিল্লাহ) বেয়াদবিরও একটা সীমা থাকা দরকার।

যাদের কিতাবের ভিত্তিতে হাদীস সহীহ-যঈফ নির্ণিত হয় তারা সকলে মাযহাব পন্থী ছিলেন

আরেকটি কথা বুঝুন। হাদীসকে সহীহ-যঈফ হিসাবে মাপা হয় মিশকাত জামাতের কিতাব 'নুখবাতুল ফিকার', উচ্চতর হাদীস গবেষণা বিভাগের কিতাব 'মুকাদ্দিমাতু ইবনিস সালাহ্' দ্বারা। যারা এসব কিতাব লিখেছেন তারাও কোন না কোন মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। গাইরে মুকাল্লিদ লা-মাযহাবী ভাইদের বক্তব্য অনুযায়ী মাযহাব অনুসরণের কারণে তারা তো বেঈমান, তাহলে তোমরা তাদের কিতাব দিয়ে সহীহ-যঈফ নির্ণয় করছো কিভাবে? আসল কথা হল, মাযহাব অনুসারীরা বেঈমান নয়, তোমরাই বরং নিজেদের ঈমানের খোঁজ নিয়ে দেখো। আর এদের কিতাব বাদ দিয়ে সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণ করো যে, সহীহ হাদীস কাকে বলে? যঈফ হাদীস কাকে বলে? তোমাদেরকে কিয়ামত পর্যন্ত সময় দেয়া হল।

লা-মাযহাবী বন্ধুগণ কি দীনের জরুরী কিতাবসমূহ পেশ করতে পারবেন?

শরীয়তের হুকুম আহকাম বর্ণনার জন্য ছয় ধরণের কিতাব প্রয়োজন: তাফসীরের কিতাব, উসূলে তাফসীরের কিতাব, হাদীসের কিতাব, উসূলে হাদীসের কিতাব, ফিকহের কিতাব, উসূলে ফিকহের কিতাব। আমরা মাযহাবওয়ালারা আমাদের লেখা এই ছয় ধরনের কিতাবই দেখাতে পারব। কোন লা-মাযহাবী বন্ধু কী দেখাতে পারবে এ ছয় বিষয়ের উপর তাদের লেখা কোন কিতাব? পারবে কিভাবে! তাদের জন্ম তো বৃটিশ বেনিয়াদের

যামানায়। আর এই কিতাবগুলো লেখা হয়েছে ১২/১৩ শত বছর আগে। ১২/১৩ শত বছর আগে তো আর ঠেলাওয়ালা, রিক্সাওয়ালা, দর্জি, সুইপার নামে আহলে হাদীসের কোন অস্তিত্ব ছিল না। কাজেই তারা দেখাবে কোথেকে? বর্তমানের আহলে হাদীসরা তো মেড ইন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী। ঠিক যেমনিভাবে গোলাম আহমাদ কাদিয়ানী বৃটিশের কারখানায় প্রস্তুতকৃত (ভন্ড) নবী'! তো একজন মুজাদ্দিদ এ সকল বদ দীনী বিষয়াদিকে চিহ্নিত করে দীন থেকে খারিজ করে দেন।

(খ) মুজাদ্দিদদের দ্বিতীয় দায়িত্বঃ দীনের অনেক জরুরী বিষয় দীন থেকে বাদ পড়ে যায় সেগুলোকে মুজাদ্দিদগণ পুনরায় দীনের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে দেন। যেমন,

১. মুর্দাকে কবরে ডান কাতে শোয়ানো সুন্নাত। (সুনানে আবী দাউদ; হা.নং ২৮৭৫) কিন্তু আমরা চিৎ করে শোয়াই। তারপর ঘাড় বাঁকা করে শুধু চেহারাটা কিবলার দিকে করে দেই। এটা কি সুন্নাত তরীকা? সুন্নাত তরীকা হল মাইয়িতের সীনাসহ পুরো শরীর কিবলার দিকে করে রাখতে হবে। শরীর চিৎ করে রেখে শুধু চেহারা কিবলামুখী করলে যথেষ্ট হবে না। (ফাতাওয়া শামী ২/২৩৫, সুনানে আবূ দাউদ; হা.নং ২৮৭৫, মুসতাদরাকে হাকেম; হা.নং ১৩০৫)

মাইয়িতকে জলদী দাফন করা সুন্নাত

২. আমরা মাইয়িতের দাফনে অযথা বিলম্ব করি। এটা জায়েয, না নাজায়েয? হাদীসের কিতাব খুলে দেখুন। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله (অর্থ) কোন মুসলমানের লাশ তার পরিবারের মধ্যে আটকে রাখা (অর্থাৎ দাফনে বিলম্ব করা) উচিত নয়। (সুনানে আবূ দাউদ; হা.নং ৩১৫৯) অথচ ছেলে দেখবে, জামাই-মেয়ে লন্ডন থেকে আসবে, সারাদেশের মানুষ জানাযায় শরীক হবে ইত্যাদি অজুহাতে আমরা এটা নির্দ্বিধায় করে যাই এবং দাফনে বিলম্ব করি।

সওয়াব রেসানীর খতমের বিনিময় লেনদেন নাজায়েয

৩. মুর্দার জন্য সওয়াব রেসানি টাকা বা বিনিময় ছাড়া হতে হবে। (ফাতাওয়া শামী ২/২৪১)

৪. খতম তারাবীহ বিনিময় ছাড়া হতে হবে। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা; হা.নং ৭৭৩৮, ৭৭৪২, মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক; হা.নং ১৯৪৪৪)

রমাযানে হাফেযদের প্রতি দরদী সাজা ঠিক নয়!

অনেকে রমযান মাস আসলে হাফেয সাহেবদের প্রতি খুব দরদী হয়ে ওঠে; তারা প্রশ্ন করে, টাকা না নিলে হাফেযরা খাবে কোত্থেকে? অথচ বাকি এগারো মাস হাফেয সাহেবদের কোন খোঁজ-খবর নেয় না। নিয়ম তো ছিল, হাফেয সাহেবগণ দুনিয়াবী পড়াশোনা ও আরাম-আয়েশকে উপেক্ষা করে নিজের সীনায় কুরআনে কারীমের দৌলত অর্জন করেছে ফলে আল্লাহর কাছে তাদের মূল্য ও মূল্যায়ন কল্পনাতীত- এই কারণে তাদেরকে সম্মান করা, মুহাব্বত করা এবং উক্ত মুহাব্বতের ভিত্তিতে সারা বছর তাদের খোঁজ-খবর নেয়া, যথাসাধ্য হাদিয়া-তোহফা ইত্যাদি পেশ করা। হাফেয সাহেবকে মুহাব্বত করার এটা বৈধ পন্থা। কিন্তু তা না করে শুধু রমযানের এক মাসই হাফেযদের প্রতি দরদ দেখায় এবং খতমে তারাবীহর বিনিময় নাজায়েয পয়সা তুলে হাফেযদেরকে দেয়।

হাফেয সাহেবদের বিশ্বাস রাখতে হবে

হে হাফেয সাহেব! তোমার সিনায় ৩০ পারা কুরআন তো তোমার বাবা রাখেনি, তুমিও রাখনি; বরং আমি মাওলায়ে কারীম নিজে রেখেছি। (সূরা কিয়ামাহ-১৭) হে হাফেযে কুরআন! তুমি সওয়াবের আশায় মানুষকে কুরআন শুনিয়ে যাও। আমি তোমার জন্য ইজ্জতের রিযিকের ব্যবস্থা করব। আমি ১১ মাস তোমাকে খাওয়াই আর এক মাস খাওয়াতে পারব না! আমার ওপর আস্থা রাখো, তোমাকে দুনিয়াদারদের সামনে বেইজ্জত করব না। কারণ 'আমি তোমাকে কুরআনের নিয়ামত এজন্য দেইনি যে, তুমি কষ্ট করবে।' (সূরা ত্ব-হা- ২)

দ্রুততম সময়ের মধ্যে মীরাস বণ্টন করা

৫. কারো মৃত্যু হলে যতদূর সম্ভব সপ্তাহ খানেকের মধ্যে ফারায়েয বের করে প্রত্যেক ওয়ারিশের প্রাপ্য বুঝিয়ে দেয়া অত্যন্ত জরুরী বিষয়। (সূরা নিসা-১০) কিন্তু আমাদের দেশে কি এটা হয়? হয় না। এটা সঠিকভাবে না হওয়ার কারণে একজনের হক অন্যজন মেরে খায়। আরও মারাত্মক কথা, মাইয়িতের নাবালেগ সন্তান থাকলে সেই ইয়াতীমের সম্পদ তার মা, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন এমনকি অনেক ক্ষেত্রে আলেম-উলামাদেরও খাওয়া হয়ে যায়, যা দোযখের আগুন খাওয়ার সমতুল্য। আল্লাহ হিফাযত করেন।

এ জাতীয় অগণিত ভুল আমাদের মধ্যে প্রচলিত আছে। মুজাদ্দিদের দ্বিতীয় কাজ হল, এ ভুলগুলো চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়া; কিতাবের পৃষ্ঠা খুলে খুলে দেখানো যে, দেখো কিতাবে কী আছে আর আমাদের সমাজ

কীভাবে চলছে আর আমাদের আমলে কী আছে? তো এই বিষয়গুলো হাতেকলমে ধরিয়ে দিয়ে সংশোধন করাই হল মুজাদ্দিদের আসল কাজ।

আখেরী উম্মতের মুজাদ্দিদ কারা?

এই উম্মতের প্রথম মুজাদ্দিদ ছিলেন হযরত উমর ইবনে আব্দুল আযীয রহ. আর শেষ মুজাদ্দিদ হবেন হযরত ইমাম মাহদী আলাইহির রিযওয়ান। এর মাঝে প্রত্যেক শতাব্দীতে মুজাদ্দিদ এসেছেন এবং ভবিষ্যতেও আল্লাহ তা'আলা পাঠাবেন।

হযরত থানবী রহ. ছিলেন ১৪ শতাব্দির মুজাদ্দিদ

গত শতাব্দীর মুজাদ্দিদ ছিলেন হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা শাহ আশরাফ আলী থানবী রহ.। তিনি দারুল উলুম দেওবন্দে যাদের কাছে লেখা-পড়া করেছেন তারা তার কর্মজীবন দেখে সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, আমাদের এই ছাত্রকে আল্লাহ তা'আলা মুজাদ্দিদ হিসেবে কবুল করেছেন।

আওলাদে রাসূল হযরত মাওলানা হুসাইন আহমাদ মাদানী রহ. ছিলেন ঐ যামানার অনেক বড় আলেম, দারুল উলূম দেওবন্দের শাইখুল হাদীস। আমরা বুখারী শরীফের সনদ বর্ণনা করতে গিয়ে তার নামও বলি। তিনি দারুল উলূম দেওবন্দে বহু বছর বুখারী শরীফ পড়িয়েছেন। আল্লামা কাশ্মীরী রহ. দেওবন্দ থেকে ডাবেল মাদরাসায় চলে যাওয়ার পর থেকে হযরত মাদানী রহ. দেওবন্দ মাদরাসায় বুখারী শরীফ পড়াতেন। তাকে এক মজলিসে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, লোকেরা মাওলানা আশরাফ আলী থানবীকে 'যামানার মুজাদ্দিদ' বলে, আপনি এ ব্যাপারে কী বলেন? তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, 'ইসমে কেয়া শ্যক হ্যায়!' অর্থাৎ মাওলানা আশরাফ আলী এই যামানার মুজাদ্দিদ, এতে সন্দেহের কী আছে!

হযরত থানবী রহ. এর অবদান

হযরত থানবী রহ. প্রায় হাজার খানেক কিতাব লিখে গেছেন। দারুল উলুম দেওবন্দের কুতুবখানায় সেগুলো সংরক্ষিত আছে। তিনি কানপুর মাদরাসায় অনেক বছর ইলমী খিদমাত আঞ্জাম দিয়েছেন। বহু এলাকায় দীনী মাহফিল করেছেন। সে সব বয়ান আজও সংরক্ষিত আছে। শেষ জীবনে তিনি থানাভবনের খানকা থেকে বহু কর্মবীর আলেমে দীন তৈরী করে গেছেন। তার বাংলাদেশী শাগরেদদের মধ্যে মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী, মাওলানা হাফেজ্জী হুযূর, মাওলানা পীরজী হুযূর, মাওলানা আতহার আলী সিলেটী, মাওলানা কুব্বাদ আলী নোয়াখালী, মাওলানা মাকসূদুল্লাহ

বরিশালী, মাওলানা আব্দুল ওয়াহহাব (মুহতামিম, হাটহাজারী) প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ অন্যতম। তার এসকল শাগরেদ অগণিত মসজিদ, মাদরাসা ও খানকাহ প্রতিষ্ঠা করে, তাবলীগ জামাআতের পৃষ্ঠপোষকতা করে এবং আরও বিভিন্ন উপায়ে দাওয়াত ইলাল্লাহর প্রায় সকল ময়দানে অবিস্মরণীয় অবদান রেখেছেন। অন্যকথায় হযরত থানবীর দরবার থেকে আসার পর তারা একেকজন একেক এলাকার জন্য হেদায়াতের নক্ষত্র হয়ে গেছেন।

মোটকথা, হযরত থানবী রহ. দীনের চতুর্মুখী কাজ আঞ্জাম দিয়েছেন। তাঁর সারা জীবনের অভিজ্ঞতা ও চিন্তা-ফিকিরের সার-নির্যাস হল, ‘মজলিসে দাওয়াতুল হক’।

হযরত থানবী রহ. কেন দাওয়াতুল হক শুরু করলেন?

তিনি মাদরাসায় পড়িয়েছেন, খানকায় আত্মশুদ্ধি করিয়েছেন, হাজার সংখ্যক কিতাবাদি লিখেছেন, ওয়াজ-মাহফিল করেছেন। তাঁর সময়ে যত ধরণের দীনী মেহনত চালু ছিল- মসজিদ, মাদরাসা বলুন আর খানকাহ এবং দাওয়াত ও তাবলীগই বলুন তিনি সবগুলো গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন, এগুলো নিয়ে গবেষণা করেছেন। পর্যবেক্ষণ ও গবেষণার পর তিনি দেখতে পেলেন, এতো রকম মেহনত চালু থাকার পরও উম্মতের দীনী যিন্দেগীতে কিসের যেন অভাব রয়ে গেছে। যেহেতু তিনি যামানার মুজাদ্দিদ ছিলেন এজন্য তার সামনে কয়েকটি সমস্যা ধরা পড়ল।

মুহতারাম উপস্থিতি! বিষয়গুলো ভালোভাবে বোঝা দরকার। সাধারণ উলামায়ে কেরাম তো মুজাদ্দিদ নন তাই এগুলো তাদের গবেষণায় না-ও আসতে পারে।

হযরত থানবী রহ.এর গবেষণা ও অনুসন্ধানের ফলাফল

হযরত থানবী রহ.এর গবেষণা ও অনুসন্ধানে যে সমস্যাগুলো ধরা পড়ল তার প্রথমটি হল ঈমান ও আকীদা-বিশ্বাস সংক্রান্ত। (অর্থাৎ আমানতু বিল্লাহি, ওয়া মালাইকাতিহী... যার ব্যাখ্যা বেহেশতী যেওর ও তা’লীমুদ্দীন কিতাবে আছে।) তিনি লক্ষ্য করলেন, উম্মতের মধ্যে ব্যাপকভাবে ঈমানের তা’লীম নেই, আকীদার তা’লীম নেই। যে কারণে সাধারণ মানুষ শুধু ‘ঈমান’ শব্দটির সঙ্গে পরিচিত কিন্তু এর মর্ম ও ব্যাখ্যা সম্পর্কে প্রায় কিছুই জানে না। অপরদিকে ঈমান-আকীদার তা’লীম যথেষ্ট পরিমাণ না থাকায় সাধারণ মানুষ না বুঝে বিভিন্ন বাতিল ও গোমরাহ ফেরকার অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে।

মুহতারাম উপস্থিতি! আমাদেরকে প্রতিদিন ঈমানের এক একটি শাখা-প্রশাখা নিয়ে নিয়মিত তা'লীম করতে হবে। ঈমানের আলোচনা ব্যাপকভাবে চালু করতে হবে। উদাহরণত একদিন ঈমানে মুফাস্সালের 'ওয়ারুসুলিহী' শাখা নিয়ে আলোচনা করা হল। তো 'রাসূলগণের প্রতি ঈমান আনলাম' এই পয়েন্টের তা'লীমে সাধ্যানুযায়ী এর সকল প্রশাখা নিয়ে আলোচনা করতে হবে। যেমন, তামাম নবী-রাসূল 'আলাইহিমুস সালাম মাটির তৈরি (অসাধারণ গুণাবলীর অধিকারী) মানুষ ছিলেন। তারা নিষ্পাপ ছিলেন। তাদের থেকে ছোট বড় কোন গোনাহ প্রকাশ পায়নি। আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে গায়বী বিষয়াদির যতটুকু তাদেরকে জানানো হয়েছে গায়বের বিষয়ে তারা ততোটুকুই জানতেন। নিজস্ব যোগ্যতায় এর অধিক গায়ব তারা জানতেনও না, জানার শক্তিও রাখতেন না। আমাদের প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তা'আলার সর্বশেষ নবী, তার পরে আর কোন ব্যক্তি পৃথিবীতে নবী হিসেবে আসবে না। তিনি ২৩ বছরের নবুওয়াতী জীবনে সাহাবীদের যে বিশাল জামাআত তৈরী করে গেছেন তারা সত্যের মাপকাঠি।

সাহাবায়ে কেরাম কেন সত্যের মাপকাঠি?

সাহাবায়ে কেরাম সত্যের মাপকাঠি হওয়ার ব্যাপারে কুরআন ও হাদীসে দলীল রয়েছে।

১. আল্লাহ তা'আলা সূরা ফাতিহায় আমাদেরকে দু'আ শিখিয়েছেন,

اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ...الخ

অর্থঃআমাদেরকে সরল সঠিক পথ দেখান এবং ঐ সকল লোকদের পথ যাদেরকে আপনি পুরষ্কৃত করেছেন। (সূরা ফাতিহা- ৫, ৬)

আবার আল্লাহ তা'আলাই পুরষ্কৃত বান্দাদের পরিচয় দিয়েছেন। ইরশাদ হচ্ছে, وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ...الخ

অর্থঃযারা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের অনুসরণ করেন তারা ঐ সকল লোকদের সাথে থাকবেন যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা পুরষ্কৃত করেছেন। অর্থাৎ নবীগণ, সিদ্দীকগণ, শহীদ ও নেককারগণ। (সূরা নিসা- ৬৯, ৭০)

আর একথা বলাই বহুল্য যে, সিদ্দীক, শহীদ ও নেককারগণের অন্যতম ছিলেন সাহাবায়ে কেরাম। তো সাহাবায়ে কেরাম সত্যের মাপকাঠি না হলে কেন আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে সীরাতে মুস্তাকীমের উদাহরণ হিসেবে পেশ করলেন?

২. আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন, فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنتُم بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوا

অর্থঃঅতঃপর তারাও যদি সে রকম ঈমান আনে যেমন ঈমান তোমরা (সাহাবাগণ) এনেছো তবে তারা হেদায়াত পেয়ে যাবে। (সূরা বাকারা- ১৩৭)

এখানে আল্লাহ তা‘আলা হেদায়াতের মাপকাঠি বানিয়েছেন সাহাবায়ে কেরামকে।

৩. আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন,

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ...الخ

অর্থঃমুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল। আর তাঁর সঙ্গে যারা আছে, তারা কাফেরদের বিরুদ্ধে কঠোর এবং নিজেদের মধ্যে একে অন্যের প্রতি দয়ার্দ্র।... (সূরা ফাতহ্- ২৯)

এখানে আল্লাহ তা‘আলা রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে তার সাহাবীদেরকেও উল্লেখ করেছেন।

৪. আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন,

وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ

অর্থঃমুহাজির ও আনসারদের মধ্যে যারা প্রথমে ঈমান এনেছে এবং যারা নিষ্ঠার সঙ্গে তাদের অনুসরণ করেছে, আল্লাহ তাদের সকলের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে এবং তাদের প্রত্যেকের জন্য এমন জান্নাত প্রস্তুত রেখেছেন যার তলদেশ দিয়ে নহর প্রবাহিত হবে। (সূরা তাওবা- ১০০)

এখানে আল্লাহ তা‘আলা সমস্ত সাহাবী ও তাদের অনুসারীদের ব্যাপারে তাঁর পূর্ণ সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন। সুতরাং সাহাবায়ে কেরাম রাযি. সত্যের মাপকাঠি।

৫. নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

إن بني إسرائيل تفرقت على ثنتين وسبعين ملة...قال ما أنا عليه وأصحابي

অর্থঃবনী ইসরাঈল ৭২ দলে বিভক্ত হয়েছিলো আর আমার উম্মত ৭৩ দলে বিভক্ত হবে। এর মধ্যে ৭২টি দল জাহান্নামে যাবে আর একটিমাত্র দল জান্নাতে যাবে। নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাজাত প্রাপ্ত দলের

পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন, ‘সেই একটি দল তারা, যারা আমি এবং আমার সাহাবীদের তরীকার ওপর আছে।’ (সুনানে তিরমিযী; হা.নং ২৬৪১)

এখানে জান্নাতের মাপকাঠি হিসেবে নবীজী শুধু নিজেকে পেশ না করে সাহাবীদেরকেও পেশ করলেন।

অতএব ‘ওয়া রুসুলিহি’ বলার সময় একজন মুসলমানকে এই সব বিষয় মানতে হবে।

মওদুদী সাহেবের মারাত্মক ভুল

অথচ মওদূদী সাহেব লিখেছেন, ‘আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূল ছাড়া আর কাউকে সত্যের মাপকাঠি মানা যাবে না’ (নাউযুবিল্লাহ)। শিয়ারা বলে! নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তিকালের পর পাঁচজন সাহাবী বাদে সকলে মুরতাদ (ধর্মত্যাগী) হয়ে গিয়েছিল! (নাউযুবিল্লাহ)। সেই পাঁচজন হলেন হযরত আলী, ফাতিমা, হাসান, হুসাইন ও আম্মার রাযিআল্লাহু আনহুম আজমাঈন। এ জাতীয় কথা বিশ্বাস করলে ঈমান তো থাকবেই না, বরং এক হাদীসে আছে, যারা সাহাবায়ে কেরামের সমালোচনা করবে তাদের ওপর আল্লাহর লা’নত। (সহীহ বুখারী; হা.নং ৩৬৭৩, শরহু মুশকিলিল আসার; হা.নং ৩২৩২, মুসনাদে আহমাদ ৪/৮৯)

সাহাবা রাযি. যদি কোন ব্যাপারে ভুলও করে থাকেন, আল্লাহ তো কুরআনের মধ্যে তাদেরকে অ্যাডভান্স মাফ করে দিয়েছেন এবং তাদের প্রতি তাঁর পূর্ণ সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন। তিনি তো অবশ্যই জানতেন যে, সাহাবীদের মধ্যে জঙ্গে জামাল, জঙ্গে সিফফীন সংঘটিত হবে। তথাপি তিনি তাদের প্রতি পূর্ণ সন্তুষ্টির ঘোষণা দিয়েছেন। সাহাবায়ে কেরামের কোন ভুল-চুক হয়ে থাকলে তার উদাহরণ সাগরে প্রস্রাব পড়ার মতো। সাগরে প্রস্রাব পড়লে সাগর নাপাক হয় না বরং প্রস্রাবই অস্তিত্ব হারায়। সাহাবায়ে কেরাম দীন-ঈমানের জন্য ত্যাগ ও কুরবানীর এবং ব্যক্তিগত নেক-আমলের এত বড় সাগর ছিলেন যে, তাদের কারও কোন ভুল-চুক হয়ে থাকলে সেগুলো উপেক্ষিত হয়ে অস্তিত্ব হারাবে; এতে তাদের সুমহান মর্যাদার কোন হানি হবে না এবং দীনের জন্য তাদের মাপকাঠি হওয়াও অগ্রাহ্য হবে না।

আলোচনা চলছিল যে, হযরত থানবী রহ. দেখতে পেলেন, আমাদের মধ্যে ঈমান আকীদার তা’লীম যথাযথভাবে হচ্ছে না। অথচ ঈমানের সকল শাখা-প্রশাখায় বিশ্বাস করার নাম হল ঈমান, আর কোন একটা অংশ অস্বীকার করার নাম বে-ঈমানী বা কুফরী।

যেমন ‘ওয়া রুসুলিহী’ শাখার একটি প্রশাখা হল ‘নবীগণ সকলেই নিষ্পাপ’। এখন কেউ এ কথাটা মানল না, মওদুদী সাহেবের মত বলে দিল যে, ‘আল্লাহ তা‘আলা প্রত্যেক নবীর দ্বারা দু-চারটি গুনাহ করিয়ে নিয়েছেন, যাতে লোকেরা বুঝতে পারে, তারা খোদা নন!’ নাউযুবিল্লাহ। তো কেউ ঈমানের সকল শাখা-প্রশাখার ওপর বিশ্বাস স্থাপন করল শুধু এই একটি প্রশাখায় বিশ্বাস করল না, এতেই সে ঈমানদারের পরিবর্তে বে-ঈমান সাব্যস্ত হবে। কত ভয়ানক ব্যাপার!

ঈমানের গুরুত্ব

ঈমান ও বিশ্বাস এত বড় সম্পদ যে, কারও মধ্যে তা সর্বনিম্ন স্তরে থাকলেও একদিন না একদিন সে জান্নাতে যাবে। আর ঈমান কবুল না হলে তার নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত, দান-খায়রাত, মাদরাসা-মসজিদ নির্মাণ সব বেকার হয়ে যাবে, সব মাটি হয়ে যাবে। কারণ ঈমান ছাড়া কোন আমলই আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য হবে না।

এজন্য কুরআন হাদীসে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব সহকারে দেয়া হয়েছে ঈমানের তা’লীম। মাশাআল্লাহ, তাবলীগী ভাইয়েরা এর আংশিক আলোচনা করেন; আর তাদের ছাড়া অন্যেরা তো ঈমানের ব্যাপারে তেমন কিছুই বলে না। অথচ সকল শ্রেণীর মুসলমানদের জন্য এটি সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেয়াই ছিল শরীয়তের দাবী।

দুই. হযরতওয়ালা থানবী রহ. লক্ষ্য করলেন, মানুষ কুরআন শরীফ পড়ে, অনেকে সহীহও পড়ে কিন্তু পরিপূর্ণ সহীহ হয় না। লোকেরা যেভাবে কুরআন পড়ে তার দ্বারা নামায মোটামুটি হয়ে যায় এবং এটাকে বারো আনা সহীহ বলা গেলেও ষোলো আনা সহীহ বলা যায় না।

উলামায়ে কেরামের এক ইজতিমায় আমি বলেছিলাম, যারা হারদুয়ী যাননি বা হারদুয়ীতে মশক করেছে এমন কারও কাছে মশক করেননি, তাদের অধিকাংশই হয়তো ‘আল্লাহু আকবার’ বাক্যটি পরিপূর্ণ শুদ্ধ করে বলতে পারবেন না। ‘হু’-কে ‘হো’ বলবেন, অথচ আরবীতে ও-কার, এ-কার নেই। গোটা কুরআন মাজীদে শুধু এক জায়গায় এ-কার আছে। কিন্তু আমরা তো বহু জায়গায় এ-কার পড়ছি। অনুরূপভাবে আপনি হয়তো কোনদিন শোনেনইনি যে, ‘পেশ’ উচ্চারণের সময় দুই ঠোঁট মিলে যাওয়ার উপক্রম হবে, ইত্যাদি।

হারদুয়ী গিয়ে যা পেলাম

আমরা ঢাকার রাহমানিয়া মাদরাসায় সহীহ বুখারী পড়ানোর পরও আল্লাহ তা'আলার বিশেষ দয়ায় শাইখের দরবারে হারদুয়ী গিয়ে নূরানী কায়িদা পড়েছি, কুরআনে কারীম বিশুদ্ধ করার মশ্ক করেছি। সেখানে গিয়ে দেখলাম, আমাদের কয়েকটি হরফ পরিপূর্ণ সহীহ নেই। আরবী ز হরফটি অনেকটা বাংলা 'য' অক্ষরের মত হবে, অথচ আমরা পড়ি ঝড়-তুফানের 'ঝ' এর মত। অর্থাৎ অক্ষরটি তুলনামূলক নরম হবে। কিন্তু আমরা অনেক শক্ত করে পড়ি; যা ঠিক নয়। আমরা এগুলো শেখার জন্য ১৫০০ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে অন্তত ১৫ বার হারদুয়ী গিয়েছি। আল্লাহর শোকর! বর্তমানে বসুন্ধরা মাদরাসায়, যাত্রাবাড়ী মাদরাসায়, রাহমানিয়া মাদরাসায় হারদুয়ী তরযে কুরআন মশক করার কেন্দ্র খোলা হয়েছে। আপনারা শিখতে চাইলে এগুলোতে চলে আসেন। আমাদের মতো ১৫০০ কিলোমিটারের কুরবানী পেশ করা আর হাজার হাজার টাকা খরচ করা আপনাদের জন্য জরুরী নয়।

তিন. হযরতওয়ালা থানবী রহ. এর গবেষণা ও অনুসন্ধানে উম্মতের তৃতীয় যে সমস্যাটি ধরা পড়ল তা হল, উম্মতের কোন আমলের মধ্যে পুর্ণ সুন্নাত তরীকার পাবন্দী নেই। উদাহরণত নামাযে ৫১টি সুন্নাত আছে। খোঁজ নিলে আমাদের নামাযে হয়তো ২০/৩০টি পাওয়া যাবে। আর বাকী সুন্নাতগুলো আমাদের নামাযে অনুপস্থিত। অথচ সুন্নাতবিহীন আমল আল্লাহর দরবারে কবুল হয় না।

নামাযে হাত উঠানো ও পা রাখার সুন্নাত তরীকা

কিছু উদাহরণ নিন। সুন্নাত হল তাকবীরে তাহরীমার সময় কান বরাবর হাত তুলতে হবে, হাতের তালু কিবলামুখী থাকবে, আঙ্গুলগুলো আকাশমুখী থাকবে। যারা সাধারণ মানুষ তারা তো তারাই, যাদেরকে মুত্তাকী পরহেযগার মনে করা হয় তারাও আঙ্গুলগুলোকে সাপের ফনার মত বানিয়ে হাত উঠায়। আবার কেউ কেউ হাতের তালু গালের দিকে করে রাখে, এটাও সুন্নাতের খেলাফ।

নামাযে দাঁড়ানোর সময় দু'পা পুরোপুরি কেবলার দিকে করে রাখতে হয়। কিন্তু ক'জন এভাবে পা রাখে? বেশিরভাগ নামাযীই দুই পা দু'দিকে উত্তর-পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিমমুখী করে রাখে। এবার শেষ থেকে একটা বলি। মুনাজাতে হাত ওঠানোর সুন্নাত তরীকা হল, হাত সিনা বরাবর ওঠাবে, তালু আসমানের দিকে থাকবে, দুই হাতের মাঝখানে সামান্য ফাঁকা থাকবে।

অথচ আমরা কেউ দুই হাত পুরোপুরি মিলিয়ে দেই, আবার কেউ অনেক বেশি ফাঁকা করে রাখি, কেউ পেটের উপরে হাত রাখি, কেউ রাখি নমস্কারের সুরতে, আবার কেউ রশি পাকাই! বলুন, ঠিক না বেঠিক? এগুলো সুন্নাতের বরখেলাফ।

মুনাজাত শুরু ও শেষ করার সুন্নাত তরীকা

দেখুন, সঠিক সুন্নাত না জানার কারণে উম্মতের নামাযে এতোগুলো গলদ তরীকা চালু হয়ে গেল। সুন্নাত হল, মুনাজাত শুরু হবে হামদ ও দুরূদের মাধ্যমে। আমরা শুরু করি 'আল্লাহুম্মা আমীন' এর মাধ্যমে। আল্লাহুম্মা আমীন দ্বারা তো মুনাজাত শেষ করতে হয়। যার দ্বারা মুনাজাত শেষ করবেন সেটা আগে আনলেন কেন? আর মুনাজাত শেষ করতে হবে হামদ, দুরূদ ও আমীন দ্বারা। অথচ আমরা শেষ করি 'বেহাক্কে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু...' দ্বারা।

মুহতারাম! সন্দেহ নেই লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু... সবচেয়ে দামী কালিমা। কিন্তু তা কোন বিশেষ স্থানে পড়তে হলে তো হাদীসের দলীল লাগবে। ধরুন, কেউ টয়লেটে প্রবেশ করার দু'আ হিসেবে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু... পড়ল। তাকে জিজ্ঞেস করলেন, আরে ভাই কী পড়লেন? উত্তরে সে বলল, কেন কোন খারাপ কালিমা পড়লাম না কি? না ভাই এটা ভাল কালিমা, কিন্তু টয়লেটে প্রবেশের জন্য তো হাদীসে ভিন্ন দু'আর কথা আছে।

এখানে শুধু নামাযের শুরু ও শেষের দুয়েকটা ভুল নিয়ে আলোচনা করা হল। পুরো নামাযে তো অনেক ভুল রয়েছে যা এত বড় মজলিসে হাতে-কলমে দেখানো সম্ভব নয়। আল্লাহ তা'আলা তার প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিবরীল আমীন আ.-এর মাধ্যমে দুই দিন দশ ওয়াক্তে দশ বার নামায দেখিয়েছেন। (আবু দাঊদ শরীফ: হাদীস নং ৩৯৩) তো নবীজীকে বাস্তব প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নামায শিক্ষা দেয়া হয়েছিল। কিন্তু আমরা কতবার নামাযের মশক করেছি, কতবার প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছি? আমাদের তার তাওফীক হয়নি।

হযরত থানবী রহ. উম্মতের তিন নম্বর সমস্যা দেখলেন

আমাদের মধ্যে সুন্নাতের আমল পরিপূর্ণভাবে নেই। সুতরাং এ ব্যাপারে তিনি উলামায়ে কেরামের মনোযোগ আকর্ষণ করলেন, তাদেরকে নিত্য পালনীয় সুন্নাতসমূহের প্রতি সবিশেষ মনোযোগ দিতে বললেন। কারণ সংস্কারের কাজ সকলের পক্ষে সম্ভব নয়। দীনী সংস্কার ও সুন্নাত পুনর্জীবনের মহান কাজ শুধু মুহাক্কিক আলেমগণই করতে পারেন।

তাবলীগের কাজ তো আলেম, গায়রে আলেম সবাই নিজ নিজ ইলম ও জ্ঞান অনুপাতে করতে পারবে। কারণ সেখানে নির্দিষ্ট ছয়টি বিষয়ের উপর আলোচনা সীমিত থাকে। কিন্তু দাওয়াতুল হকের কাজ শুধু বিদগ্ধ ও অনুসন্ধিৎসু আলেমগণই করতে পারবেন। কারণ কোন ব্যাপারে বাহ্যিকভাবে বিপরীতমুখী একাধিক আয়াত ও হাদীসের মধ্যে কোনটির ওপর আমল করা সুন্নাত ও উত্তম হবে গবেষণা করে তা বের করতে অনেক ইলম দরকার। বুখারী শরীফের বঙ্গানুবাদ কিংবা দু-চারটে বাংলা/ইংরেজী তাফসীর পড়ে এটা বের করা অসম্ভব। বস্তুত দাওয়াতুল হকের কাজটি উলামায়ে কেরামের শান ও মান অনুযায়ী একটি বিরাট দীনী খিদমত। তাছাড়া হাদীস শরীফে গোরাবাদেরকে জান্নাতের সুসংবাদ দেয়া হয়েছে, যারা নবীজীর বিগড়ে যাওয়া সুন্নাতসমূহ সংশোধন করে দেয়। বলুন তো, বর্তমান বিশ্বে কোন কোন জামা'আত এই কাজটি আঞ্জাম দিচ্ছে? উলামায়ে কেরামের ধারণা, তুলনামূলক এ খিদমতটি বেশি আঞ্জাম পাচ্ছে মজলিসে দাওয়াতুল হকের মাধ্যমে।

চার. হযরত থানবী রহ. উম্মতের মধ্যে চতুর্থ যে সমস্যাটি লক্ষ্য করলেন তা হল, মুনকারাত তথা শরীয়ত যে কাজগুলোকে হারাম বা মাকরূহে তাহরীমী সাব্যস্ত করেছে এগুলোর তা'লীম ঠিকমত দেয়া হচ্ছে না। সবাই শুধু করণীয় ও ইতিবাচক কাজগুলোর কথা বলছে। বর্জনীয় ও নেতিবাচক বিষয়গুলো কেউ খুলে খুলে বলছে না যে, এগুলো কবীরা গুনাহ, এগুলো হারাম, এগুলো মাকরূহে তাহরীমী।

কয়েকটি কবীরা গুনাহ

উদাহরণস্বরূপ, একজন ল্যাংড়া ব্যক্তিকে ল্যাংড়া কিংবা কানা ব্যক্তিকে কানা বলে ডাকা যে কবীরা গুনাহ আপনারা তা জানেন? দু-একজন ছাড়া কারও এ ব্যাপারে খবর নেই। এমন বহু গুনাহ আছে, যেগুলোর গুনাহ হওয়ার ব্যাপারেই আমরা বিলকুল অজ্ঞ।

দাড়ি রাখা ওয়াজিব, কিন্তু চেঁছে ফেলা বা চার আঙ্গুলের চেয়ে খাটো করা হারাম। অনেকে দাড়ি রাখাকে আইনগত সুন্নাত মনে করে এ ব্যাপারে অলসতা করছে। অথচ নবীর আদর্শ হিসেবে দাড়ি রাখাকে আভিধানিক অর্থে সুন্নাত বলা গেলেও আইনগতভাবে তা ওয়াজিব। ঠিক যেমন পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়াকে নবীর আদর্শ হিসেবে আভিধানিক অর্থে কেউ সুন্নাতও বলতে পারে কিন্তু তার আইনগত পজিশন হল ফরয এবং শরীয়ত সম্মত ওযর ছাড়া নামায তরক করা কবীরা গুনাহ- হারাম।

অনুরূপ বর্তমানে বিবাহ-শাদীতে ছেলে পক্ষ মেয়ের পিতার সঙ্গে এরূপ শর্ত করে যে, আমাদের দু'শ মেহমানকে খাওয়াতে হবে। মনে রাখতে হবে, মুসলমানের বিয়েতে শরীয়ত দুটি খাতে অর্থ ব্যয়ের অনুমতি দিয়েছে। মহর ও ওলীমা। আর এ দু'টি খরচই ছেলের দায়িত্বে। বিবাহ-শাদীর ক্ষেত্রে শরীয়ত মেয়ের অভিভাবকের যিম্মায় কোন ধরণের খরচের দায়-দায়িত্ব চাপায়নি। এমনকি মেয়েকে বিদায় দিতে মেয়ের বাড়িতে তার যে সব আত্মীয়-স্বজন আসবে এ সময় তাদেরকে আপ্যায়ন করাও মেয়ের অভিভাবকের দায়িত্ব নয়। প্রয়োজনে এসকল আত্মীয়-স্বজন টিফিন ক্যারিয়ারে করে খানা-পিনা নিয়ে আসবে। কারণ, এই মেয়েকে তার অভিভাবক ১৫/১৬ বছর ধরে লালন-পালন করে বড় করেছে। তার জন্য অনেক টাকা-পয়সা ব্যয় করেছে। এ জন্য আল্লাহ তা'আলা অভিভাবকের যিম্মায় মেয়ের বিবাহে উল্লেখযোগ্য কোন খরচ রাখেননি। সুতরাং বিবাহ উপলক্ষে মেয়ের বাড়িতে এ ধরনের দাওয়াত খাওয়া বৈধ নয়। আমার শায়খ হযরতওয়ালা আবরারুল হক রহ. এর দলীল স্বরূপ নবীজীর এই হাদীসটি পাঠ করতেন, دخل سارقا وخرج مغيرا

অর্থঃ সে চোর হয়ে ঢুকল, আর ডাকাত হয়ে বের হলো। (সুনানে বাইহাকী কুবরা; হা.নং ১৪৫৪৯)

এখন বলুন! এক ওয়াক্ত খানা খাওয়ার বিনিময়ে কে কে ডাকাত আর চোর হতে চান? খবরদার! অতীতে যা হয়েছে তার জন্য তওবা করুন। ভবিষ্যতে না খাওয়ার পাক্কা এরাদা করুন। কত জঘন্য ব্যাপার! খানা খেলেন এক বেলা, আর নবীজীর পক্ষ হতে সার্টিফিকেট পেলেন দু'টি; চোর আর ডাকাত। সুতরাং এরূপ হারাম খানা অবশ্যই পরহেয করুন।

তবে বিয়ের সময় ছেলের বাড়িতে তার সাধ্য অনুযায়ী (অপচয়, অপব্যয়, লোক দেখানো ও উপঢৌকন অর্জনের উদ্দেশ্য ব্যতীত এবং গোনাহমুক্তভাবে) দাওয়াতের ব্যবস্থা করা সুন্নাত, যেটাকে ওলীমা বলা হয়। এতে অংশগ্রহণ করা জায়েয; বরং নবীজীর সুন্নাত।

মসজিদে গুনাহে কবীরার আলোচনা সংবলিত কিতাবের তা'লীম করা জরুরী

কাজেই প্রতিটি মসজিদে গুনাহে কবীরার আলোচনা সংবলিত কিতাব তা'লীম করতে হবে। জনসাধারণকে জানাতে হবে যে, এটা হালাল, এটা হারাম, এটা জায়েয, এটা নাজায়েয। ইলম না থাকায় মানুষ আজ হাসতে হাসতে গোনাহ করছে। যখন মুনকারগুলোর তা'লীম চালু হবে, ইনশাআল্লাহ

মুমিন ব্যক্তি তার অন্তরে বিদ্যমান খোদাভীতির কারণে এসব গোনাহে জড়িত হবে না।

আমি যে গুনাহে কবীরার কথা বললাম যদি কেউ এর কোনটাকে হালাল মনে করে তাতে লিপ্ত হয় তাহলে তার ঈমান থাকবে না। আর যদি গোনাহকে হারাম মনে করে তাতে লিপ্ত হয় তাহলে তার ঈমান নষ্ট হবে না বটে, কিন্তু সে ফাসেক সাব্যস্ত হবে। তাকে গুনাহগার মুমিন বলা হবে।

হারামকে হালাল মনে করলে ঈমান থাকে না

বলুন, কেউ মদ খাওয়ার সময় বিসমিল্লাহ পড়লে তার ঈমান থাকবে? থাকবে না। আজকাল সাধারণ দোকানেও ভিন্ন নামে মদের বেচা-বিক্রি চলছে। মদ এখন ‘এনার্জি ড্রিংক’-এর লেবেলে বাজারজাত করা হচ্ছে। এগুলো পান করবেন না। এগুলোর মধ্যে মদ আছে। হাদীসে আছে, কিয়ামতের পূর্বে বিভিন্ন নামে ‘মদ’ চালু হবে। (সুনানে আবূ দাউদ; হা.নং ৩৬৮৮, সুনানে ইবনে মাজাহ; হা.নং ৪০২০) এটা তারই নমুনা।

প্রচলিত জমি বন্ধক সুদী লেনদেনের অন্তর্ভুক্ত

গ্রামাঞ্চলে জমি বন্ধকের একটা পদ্ধতি আছে। ঋণগ্রহিতা কর্তৃক ঋণ পরিশোধ করার পূর্ব পর্যন্ত ঋণদাতা বন্ধকী জমিতে চাষাবাদ করে বা অন্য কোন উপায়ে জমি দ্বারা উপকৃত হতে থাকে। এ পদ্ধতির বন্ধকী লেনদেন হারাম এবং ঋণদাতার উৎপাদিত ফসল ও উপার্জন সুদ। হ্যাঁ বন্ধকী লেনদেন জায়েয আছে। কারণ এতে প্রদত্ত ঋণের নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়। এর বৈধ সুরত হল, কাউকে ঋণ দিয়ে তার জমির দলীল বন্ধক রাখবেন আর জমি তার মালিককেই ভোগ করতে দিবেন। এতে আপনার দেয়া ঋণের নিরাপত্তাও নিশ্চিত হবে এবং বন্ধকটাও সহীহ হবে। পাশাপাশি ঋণ দেওয়ার কারণে আপনি সাওয়াবও পাবেন। কোন কোন হাদীসে সাধারণ দানের চেয়ে ঋণ দেওয়ার সওয়াব ১৮ গুণ এবং কোন কোন হাদীসে ২০ গুণ বেশি সওয়াব বলা হয়েছে। (ত্ববারানী কাবীর; হা.নং ৭৯৭৬)

নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

كل قرض جر نفعا فهو ربوا

অর্থঃ ঋণের বিপরীতে অর্জিত সর্বপ্রকার লাভ সুদ বলে গণ্য। (শরহু মা‘আনিল আসার; হা.নং ৫৭৩৫)

উদাহরণত এক বন্ধুকে ২০,০০০/- টাকা ঋণ দিলেন। ইতোপূর্বে কোনদিনও সে আপনার বাড়িতে বাজার-সদাই পাঠায়নি, মিষ্টি-মিঠাই পাঠায়নি। কিন্তু

ঋণ দেয়ার পর এখন মাঝে-মধ্যে এগুলো পাঠাচ্ছে। বুঝতে হবে এটা সুদ। তবে পূর্ব থেকেই যদি এ জাতীয় উপহার-উপঢৌকন পাঠানোর অভ্যাস তার থাকে অতঃপর ঋণ নেয়ার পরও তা জারী রাখে তাহলে তা জায়িয হবে, সুদ হবে না। এখন বলুন, এগুলো জানার দরকার আছে কি না? এই যে ওয়ায মাহফিল হচ্ছে এর উদ্দেশ্য কী? এর উদ্দেশ্য হল, আমরা হক্কানী উলামায়ে কেরামের কাছ থেকে দীনী বিষয়াদি শিখব এবং নিজেদের ভুল-ভ্রান্তিগুলো জেনে আমাদের যিন্দেগী সংশোধন করে নেবো। কিন্তু অধিকাংশ মাহফিলে এগুলোর আলোচনা না হওয়ায় ভুল তো থেকেই যাচ্ছে। আল্লাহ তা'আলা আমাদের প্রতি রহম করুন।

পাঁচ. হযরতওয়ালা থানবী রহ. পঞ্চম যে সমস্যাটি লক্ষ্য করলেন তা হল, মু'আমালাত ও মু'আশারাত অর্থাৎ লেনদেন ও সামাজিকতা তথা হুকূকুল ইবাদ সম্পর্কে উম্মতের সীমাহীন গাফলতি। তিনি দেখলেন, উম্মত অগণিত ভুলভ্রান্তি এবং বহুরকম প্রান্তিকতা সত্ত্বেও ঈমান ও ইবাদাতকে অন্তত দীন মনে করে। কিন্তু সাধারণ উম্মত তো দূরের কথা, দীনদার হিসেবে পরিচিত ব্যক্তিবর্গও মু'আমালাত মু'আশারাতকে দীন ও শরীয়তের অংশই মনে করে না এবং এগুলোর মাসআলা জানার ব্যাপারে গুরুত্বই দেয় না।

এ প্রসঙ্গে জনৈক আলেমের ঘটনা

একবার হযরত থানবী রহ. এর জনৈক আলেম খলীফা স্বীয় সন্তানসহ হযরতের সঙ্গে দেখা করতে আসলেন। তিনি আলেম সাহেবকে জিজ্ঞেস করলেন, রেলগাড়িতে বাচ্চাটির জন্যও টিকেট করা হয়েছিল কি না? আলেম সাহেব জবাব দিলেন, জী হ্যাঁ। থানবী রহ. দ্বিতীয় প্রশ্ন করলেন, ফুল টিকেট না হাফ টিকেট? আলেম বললেন, হাফ টিকেট। থানবী রহ. প্রশ্ন করলেন, ওর বয়স কত? আলেম সাহেব বললেন, বারো বছর। থানবী রহ. প্রশ্ন করলেন, বারো বছরের বাচ্চার জন্য তো ফুল টিকেট করার আইন। আলেম সাহেব উত্তরে বললেন, ফুল টিকেট কাটার বয়স হওয়া সত্ত্বেও দেখতে ছোট হওয়ায় তার জন্য ফুল টিকেট করা হয়নি। হযরত থানবী রহ. জিজ্ঞাসা করলেন, দেখতে ছোট হলে বারো বছরের বাচ্চার জন্য হাফ টিকেট করা যাবে এমন আইন কোথায় পেলেন? আলেম সাহেব কোন উত্তর দিতে পারলেন না। তখন থানবী রহ. অত্যন্ত গোস্বা হলেন, এমনকি উক্ত ব্যক্তির খেলাফত কেটে দিয়ে তাকে খানকা থেকে বের করে দিলেন এবং বললেন, তাসাওউফের বাতাসও তোমার শরীরে লাগেনি।

লেনদেন ও বান্দার হকের গুরুত্ব

কারণ নামায রোযা ইত্যাদি ইবাদত-বন্দেগীর মাধ্যমে মানুষ প্রচুর পরিমাণে সাওয়াব অর্জন করে থাকে। আর মু'আমালাত মু'আশারাত সেই সাওয়াবসমূহকে সঠিকভাবে হেফাজত করে। মানুষ ইবাদাতের মাধ্যমে পাহাড় পরিমাণ সাওয়াবের অধিকারীই হোক না কেন যদি তার মু'আমালাত ও মু'আশারাত ঠিক না থাকে তাহলে হাদীসের ভাষ্য অনুযায়ী কিয়ামতের দিন সে হবে সবচেয়ে গরীব, সবচেয়ে নিঃস্ব। অবৈধ উপার্জনের কারণে বা কারো হক অনাদায়ী থাকার অপরাধে তার সওয়াবগুলো পাওনাদারদের মধ্যে বণ্টন করে দেয়া হবে। আর তাকে অধঃমুখী করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। এজন্য হযরত থানবী রহ. এ ব্যাপারটিকে উম্মতের সামনে যথাযথ মর্যাদায় তুলে ধরা জরুরী মনে করলেন।

হাকীমুল উম্মত থানবী রহ. এর সামনে সমস্যা তো অনেক ছিল কিন্তু এই পাঁচটি এমন মৌলিক সমস্যা যেগুলোর প্রতি কেউ ভালোভাবে খেয়াল করছিল না।

মজলিসে দাওয়াতুল হকের ভিত্তিস্থাপন

সমস্যাগুলো নির্ণয়ের পর হযরত থানবী রহ. তার খলীফাদেরকে ডেকে বললেন, এই পাঁচটি সমস্যার দিকে কেউ ভালোভাবে খেয়াল করছে না। আমি এগুলো ঠিক করার জন্য একটি মেহনত চালু করতে চাই, তোমরা এর একটি নাম ঠিক কর। বিভিন্ন জন বিভিন্ন নাম পেশ করলেন। মাওলানা আব্দুল গনী ফুলপুরী রহ. বললেন, হুযূর! এর নাম 'দাওয়াতুল হক' হলে ভাল হয়। অতঃপর এর সমর্থনে তিনি কুরআনে কারীমের আয়াত তিলাওয়াত করলেন- 'লাহু দা'ওয়াতুল হক'। হযরত থানবী রহ.-সহ উপস্থিত সকলে নামটি পছন্দ করলেন। নাম নির্ধারণের পর হযরত থানবী রহ. তার খলীফাদেরকে বললেন, তোমরা যারা যারা এই কাজ করতে আগ্রহী তারা নাম লেখাও এবং প্রত্যেক এলাকায় হালকা বা কমিটি বানিয়ে কাজ শুরু করে দাও। ব্যস, এভাবেই শুরু হল সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক এবং মুখলিসানা একটি দীনী মেহনত। মজলিসে দাওয়াতুল হক হল হযরত থানবী রহ.-এর সারা জীবনের খোলাসা, সারাংশ ও নিচোড়। অতঃপর তার খলীফারা যে যে দেশে এবং যে যে এলাকায় ছিলেন, প্রত্যেকে নিজ নিজ দেশের নিজ নিজ এলাকায় এই কাজ চালু করে দিলেন। আল্লাহর অশেষ রহমতে কাজ দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলল।

ঢাকায় দাওয়াতুল হকের কাজের সূচনা

আমাদের দেশেও ঠিক তা-ই হল। ঢাকায় আমার উস্তাদ ও প্রথম শাইখ হযরত হাফেজ্জী হুযূর রহ. এই কাজটা ধরে রেখেছিলেন। তার ওখানে প্রতি সপ্তাহে মালফূযাত তা'লীম হতো, কিরাআত মশক হতো এবং এর ধারাবাহিকতায় বিভিন্ন জায়গায় কুরআনী মকতবও চালু হয়েছিল। তিনি ৬৮ হাজার গ্রামে ৬৮ হাজার কুরআনী মকতব কায়েমের উদ্যোগ নিয়েছিলেন। এছাড়াও বিভিন্ন এলাকায় দাওয়াতুল হকের আন্দাযে ছোট ছোট মাহফিল অনুষ্ঠিত হতো।

হারদুয়ী হযরতের ঢাকা আগমন

যিন্দেগীর শেষ দিকে হযরত হাফেজ্জী হুযূর রহ. লক্ষ্য করলেন, তার হায়াত তো শেষ পর্যায়ে, কিন্তু হাকীমুল উম্মতের খলীফাদের মধ্যে সারা বাংলাদেশে ব্যাপকভাবে এই পদ্ধতিতে কাজ করার লোক নেহায়েত কম। এ সময় তিনি এক হজ্জের সফরে আমার দ্বিতীয় শাইখ, হযরত মাও. শাহ সায়্যিদ আবরারুল হক রহ.কে এবং তাঁর খলীফা হযরত মাওলানা শাহ মুহাম্মাদ হাকীম আখতার সাহেব রহ.-কে বাংলাদেশে আসার দাওয়াত দিয়ে আসলেন। তিনি তাদেরকে বললেন, আমিতো বুড়ো হয়ে গেছি, আমার পক্ষে দৌড়ঝাঁপ করা অত্যন্ত কঠিন। আপনার মাশাআল্লাহ শক্তি-সামর্থ আছেন, আপনাদের দুজনকে আমার বাংলাদেশে আসতে হবে এবং দাওয়াতুল হকের কাজ ওঠানোর দায়িত্ব নিতে হবে।

করাচী হযরতের ঢাকায় আগমন

আল্লাহর মেহেরবানীতে উভয় বুযুর্গ দাওয়াত কবুল করলেন। হজ্জের কিছুদিন পর প্রথমে করাচী হতে হযরত হাকীম আখতার সাহেব রহ. বাংলাদেশে আগমন করলেন। এ সফরে তিনি লালবাগ মাদরাসায় অবস্থান করেছিলেন। সে সময় আমি তার খাদেম ছিলাম। বাঁধানো দাঁত খুলে তাকে মিসওয়াক করানো, মাথায় তেল দিয়ে দেয়া ইত্যাদি খিদমত করার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। কিছুদিন পর ১৯৮১ খ্রিস্টাব্দে মাওলানা শাহ আবরারুল হক রহ.ও প্রথমবার বাংলাদেশে তাশরীফ আনলেন। বস্তুত তিনি ছিলেন বর্তমান শতাব্দীর মুজাদ্দিদ। যা সমসাময়িক বড় বড় উলামায়ে কেরাম কর্তৃক স্বীকৃত।

হাফেজ্জী হুযূরের শেষ নির্দেশ

হযরত হাফেজ্জী হুযূর রহ. তার প্রতিষ্ঠিত নূরিয়া মাদরাসার খানকায় এই দুই বুযুর্গকে সামনে রেখে আমরা যারা তার মুরীদ ছিলাম নির্দেশ দিলেন, তোমরা আমার এই পীর ভাই (মাওলানা শাহ আবরারুল হক সাহেব রহ.)

অথবা তাঁর এই খলীফা (আরেফ বিল্লাহ শাহ হাকীম মুহাম্মাদ আখতার সাহেব রহ.)-এর হাতে মুরীদ হয়ে যাও। আমি হয়তো বেশিদিন দুনিয়াতে থাকব না। আমি তোমাদেরকে এই দুই বুযুর্গের হাতে তুলে দিয়ে গেলাম। হযরত হাফেজ্জী রহ.-এর নির্দেশে তারই খানকায় এই দুই বুযুর্গের মধ্যে যাকে যার মুনাসিব মনে হয়েছিল আমরা তার হাতে বাইআত হয়ে গেলাম।

হারদুয়ী হযরতের বাংলাদেশ সফর জারী হয়ে গেল এবং দাওয়াতুল হকের কমিটি ঢেলে সাজানো হল

কিছুদিন পর হযরত হাফেজ্জী হুযূরের ইন্তেকাল হয়ে গেল। এই দুই বুযুর্গেরও বাংলাদেশে আসা-যাওয়া চালু হয়ে গেল। হযরতওয়ালা হারদুয়ী রহ. বাংলাদেশের দ্বিতীয় সফরে ধানমন্ডির হাজী হাবিবুল্লাহ সাহেবের বাড়িতে আমাদেরকে সমবেত করে বললেন, তোমরা থানাভিত্তিক ভাগ হয়ে যাও। ঢাকায় যতগুলো থানা আছে সে অনুযায়ী আলাদা আলাদা বসো। আমরা সেভাবে ভাগ হয়ে বসলাম। তারপর তিনি নির্দেশ দিলেন, ভাগ তো হলে, এখন নিজেদের পছন্দ অনুযায়ী একজনকে থানা আমীর আর দু-একজনকে নায়েবে আমীর বানাও। তারপর থানা আমীরদের মধ্য হতে একজনকে আমীরদের আমীর বানাও। আমরা সেভাবেই করলাম। এরপর হযরত হারদুয়ী রহ. নিজে হযরতুল আল্লাম, শাইখুল হাদীস, আল্লামা মাহমুদুল হাসান দা.বা.-কে আমীরদের আমীর বানিয়ে দিলেন। আমরাও সর্বসম্মতিক্রমে তা মেনে নিলাম। হযরতওয়ালা আমাদের কামিয়াবীর জন্য ভরপুর দু‘আ করলেন।

মজলিসে দাওয়াতুল হকের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও কর্মসূচী

তারপর বললেন, তোমরা এখন কাজ শুরু কর। তোমাদের কাজ হল,

১. তোমাদের নিজ নিজ থানার কোন একটা মসজিদকে দাওয়াতুল হকের মারকায বানাবে। সেখানে ‘মাসিক ইজতিমা’ হবে। এ ইজতিমায় সুন্নাতের ওপর কিছু বয়ান হবে, বাকী সময় সুন্নাতের আমলী মশক হবে।

২. যারা সদস্য হবে তাদেরকে নিয়ে সেখানে ‘মজলিসে আরাকীন’ নামে একটা মাসিক মজলিস হবে। উক্ত মজলিসে আরাকীনে সিদ্ধান্ত হবে কোথায় কোথায় প্রোগ্রাম করা হবে, কে কে বয়ান করবে। উক্ত মজলিসে নিজেদের মধ্যে পরস্পরে মশক ও মুযাকারা করবে।

৩. কমিটির পক্ষ থেকে প্রতি থানায় প্রতি সপ্তাহে একটি করে মাসে মোট চারটি ‘গাশতী মাহফিল’ হবে। এই মাহফিল কোন মসজিদে, কারো

বাড়িতে, কোন কাচারীতে বা স্কুলেও করা যাবে। মোটকথা যেখানে সুযোগ পাওয়া যায় সেখানেই করতে পারবে। গাশতী মাহফিলে সুন্নাতের ওপর কিছুক্ষণ বয়ান হবে, তারপর আমলী মশকের ব্যবস্থা করবে। তবে এসব মাহফিলে কোন প্রকার খানা-পিনা, চা-নাস্তার ব্যবস্থা থাকবে না। দাওয়াত খাওয়া সুন্নাত বটে, তবে কাজের সুবিধার্থে সেটা মাহফিলের সাথে না হয়ে ভিন্নভাবে হবে।

৪. বছরে ২/৩ বার মারকাযে খাছভাবে উলামায়ে কেরামের মজলিস করবে। সেখানে আলেমদের দায়িত্ব কর্তব্য নিয়ে মুযাকারা হবে এবং নিজের ত্রুটি বিচ্যুতি, কমি-খামী দূর করার ফিকির করবে।

৫. এলাকার সকল মসজিদে ইমাম সাহেবদের মাধ্যমে ঈমান-আকীদার কোন নির্ভরযোগ্য কিতাব ও 'এক মিনিটের মাদরাসা' নামক কিতাবের তা'লীম চালু করবে।

৬. প্রয়োজনীয় স্থানে ফুরকানিয়া বা নূরানী মকতব কায়েম করবে। এসব মকতবে শিশুরা এবং দিনের কোন এক সময় বয়স্করা কুরআন শিখবে এবং দীনের জরুরী মাসআলা ও সুন্নাতসমূহ শিক্ষা করবে।

৭. সকল বড় মাদরাসায় উলামায়ে কেরাম, হুফফায ও কারীদের কুরআন সহীহ করার জন্য 'তাকমীলে তাসহীহ' নাম দিয়ে কুরআন শিক্ষা বিভাগ খুলবে।

৮. রমযানে হাদিয়া ছাড়া খতম তারাবীহ পড়ানোর জন্য হাফেয সরবরাহের ব্যবস্থা করবে।

৯. সুন্নাত তরীকায় বিবাহ-শাদী, সুন্নাত তরীকায় কাফন দাফন, লেনদেন ও বান্দার হকের মাসআলা শিক্ষা দেয়ার ব্যবস্থা করবে।

১০. খিদমতে খালকের দায়িত্ব অঞ্জাম দিবে। অর্থাৎ কোন এলাকায় বিপদ-আপদ দেখা দিলে তাদের খেদমতের জন্য প্রয়োজনীয় সামান নিয়ে তাদের পাশে দাঁড়াবে।

হারদুয়ী হযরতের বাতানো এই নকশার উপর কাজ শুরু হয়ে গেল। কেন্দ্রীয় মুরুব্বীরা তাদের সময় সুযোগ মতো জেলায় জেলায় ও থানায় থানায় সফর করে উক্ত নিয়মে কমিটি করে দিলেন। আলহামদুলিল্লাহ, বাংলাদেশের অধিকাংশ এলাকায় এ পদ্ধতিতে কাজ শুরু হয়ে গেছে।

এখন সকল আলেম ও দীনদার লোকদের দায়িত্ব বিলম্ব না করে এ নিয়মে দাওয়াতুল হকের কাজ শুরু করে দেয়া

আপনারা যারা এই মহাসম্মেলনে উপস্থিত হয়েছেন আপনারাও নিজ নিজ এলাকায় মজলিসে দাওয়াতুল হকের হালকা বা কমিটি গঠন করে নিন। আর এতক্ষণ যেভাবে বললাম হালকাগুলোতে এভাবে মেহনত চালু করে দিন। মনে রাখবেন, দাওয়াতুল হক সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক দাওয়াতী মেহনত। কাজেই এ ব্যাপারে খুব খেয়াল রাখবেন। এটিকে রাজনৈতিক স্টাইলে মিটিং-মিছিল, লাঠি-সোঠা, লংমার্চ, রোডমার্চ-এর মাধ্যমে করা যাবে না।

তাবলীগী মেহনত থাকতে এ মেহনতের কী প্রয়োজন?

কেউ কেউ বলতে পারেন, হুযূর! তাহলে 'তাবলীগ জামা'আত'-এর কাজটা কী? তাবলীগী জামা'আত থাকতে মজলিসে দাওয়াতুল হকের প্রয়োজন কী? এর উত্তর হল, দাওয়াতুল হক ও দাওয়াতে তাবলীগ এই দু'টোর মধ্যে কোন বিরোধ নেই এবং তেমন কোন পার্থক্যও নেই। বিষয়টি ভালভাবে বুঝুন, মালফূযাতুশ শাইখ নামক কিতাবে আছে, তবলীগ জামাআতের মধ্যে স্বতন্ত্রভাবে 'নাহি আনিল মুনকার'-এর কাজ যোগ করা হবে কি না এ নিয়ে শুরুর দিকে আমাদের উলামায়ে কেরামের মধ্যে মতভেদ হয়েছিলো। হযরত থানবী রহ. এর কাছে ফায়সালা চাওয়া হলে তিনি সিদ্ধান্ত দিয়েছিলেন যে, না, তবলীগ জামাআতের কাজের মধ্যে স্বতন্ত্রভাবে 'নাহি আনিল মুনকার' যোগ করা যাবে না। করলে এটা সারা বিশ্বে সকলের কাছে পৌঁছতে পারবে না। তাহলে একই মুরুব্বীর যখন দু'টি কাজ হল তখন মতবিরোধ হওয়ার কোন সুযোগ থাকল না।

খেয়াল করুন! তবলীগে গিয়ে মানুষের অন্তরে দীনের বুঝ পয়দা হয়। চিল্লা শেষে রুখসতের সময় মারকাযের পক্ষ থেকে বলে দেয়া হয়, 'ভাই এই অল্প সময়ে আমরা সবকিছু শিখতে পারিনি। কিন্তু এটা বুঝেছি যে, বাড়িতে গিয়ে আমাদেরকে স্থানীয় উলামায়ে কেরামের নিকট থেকে এভাবে কুরআনে কারীম, নামায, মাসআলা-মাসাইল, জায়েয না-জায়েয, হালাল-হারাম ইত্যাদি অবশ্যই শিখতে হবে।' বলাবাহুল্য এসব শেখা এবং জানার উলামায়ে কেরাম কর্তৃক যে ব্যবস্থা, সেই ব্যবস্থাপনার নামই মজলিসে দাওয়াতুল হক।

আরও বুঝুন, সাইকেল চালাতে দু'টি চাকা লাগে। দাওয়াত ও তাবলীগ এবং দাওয়াতুল হক দীনের দুই চাকার মত। পরস্পরে কোন সংঘর্ষ নেই।

একই ব্যক্তি দাওয়াতুল হক থেকে দীনের সহীহ তা'লীম শিখবে আবার তাবলীগে গিয়ে দশ ভাইকে শিখিয়ে আসবে এবং নিজের ঈমান ও তাওয়াক্কুল মজবুত করে আসবে, দাওয়াতের দায়িত্ব পালন করে আসবে।

যেমনিভাবে আপনারা ঢাকা থেকে পাইকারী দরে মাল কিনে রংপুরে এনে খুচরায় বিক্রি করেন, ঠিক তেমনি দাওয়াতুল হক হল পাইকারী মার্কেট আর তাবলীগ হল খুচরা মার্কেট। এ জন্য দাওয়াতুল হক থেকে সকল আমল সুন্নাত তরীকায় শিখে তাবলীগে গেলে আপনাদের দ্বারা উম্মতের ফায়দা অনেক বেশি হবে।

মাদরাসাগুলোর সমস্যার সমাধান

মাদরাসাগুলো এ কাজকে কাজ বানালে ইনশাআল্লাহ তাদের আর্থিক সঙ্কট ও ছাত্রস্বল্পতার সমস্যা দূর হবে, যে কোন মাদরাসা-কর্তৃপক্ষ এর বাস্তবতা যাচাই করে দেখতে পারেন। যেসব মাদরাসা-কর্তৃপক্ষ এ কাজকে গ্রহণ করেছেন তারা অবশ্যই এর ফায়েদা প্রত্যক্ষ করছেন।

শেষ কথা হল, এই কাজ না করলে কী হবে? লক্ষ্য করুন!

রাশিয়া ইলমের মারকায ছিল। এ কাজে অলসতা করায় তাদের করুণ পরিণতি!

একটু ভেবে দেখুন, আমাদের মাদরাসাসমূহে হাদীসের যে কিতাবগুলো পড়ানো হয় এগুলো সংকলন করেছেন রাশিয়ার আলেমগণ। রাশিয়ায় ইসলাম প্রবেশ করেছে হযরত উসমান গনী রাযি.-এর যামানায়। হযরত কুসাম ইবনে আব্বাস রাযি., হযরত সাঈদ ইবনে উসমান রাযি. প্রমুখ সাহাবায়ে কেরাম সেখানে ইসলামের দাওয়াত নিয়ে আগমন করেছেন। তৎকালীন সময়ে এই রাশিয়াই ছিল ইসলাম ও ইলমের মারকায। কিন্তু একসময় সেখানে আমভাবে জনগণের উপর মেহনত কমে গেল। উলামায়ে কেরামগণ মাদরাসা নিয়ে বিশেষ ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। আওয়ামের উপর উল্লেখযোগ্য খেয়াল রাখলেন না। এই সুযোগে লেনিন, কার্লমার্কসরা সেখানে সমাজতন্ত্র কায়েম করল। সাধারণ জনগণকে উলামায়ে কেরামের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে দিল। যে সব মানুষ আগের দিনও উলামায়ে কেরামকে শ্রদ্ধা করত, পরদিন তারাই উলামায়ে কেরামের বুকে বন্দুক চালাল। কম্যুনিস্টরা প্রায় ৫০ হাজার উলামায়ে কেরাম ও দেড় কোটি জমিদারকে শহীদ করে রাশিয়ায় লাল বিপ্লব সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করল। কিছু লোক পালিয়ে ভারতবর্ষে চলে আসল। লক্ষ্য করুন এক সময় যে ভূ-খন্ড ছিল

ইসলামের মারকায, দীনের ধারক বাহকদের জন্য নিবেদিত প্রাণ, মাত্র কয়েক বছরের ব্যবধানে তা সমাজতন্ত্রের ঘাঁটিতে পরিণত হল।

মুসলিম প্রধান বাংলাদেশ কোন দিকে এগুচ্ছে!

আজ আমরাও ধীরে ধীরে রাশিয়ার পরিণতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। লক্ষ্য করলে দেখবেন, আমাদের দেশের সাধারণ শিক্ষার দায়িত্ব কাদের হাতে দেয়া হয়েছে? বলুন! তারা কি মার্কামারা নাস্তিকের দল নয়? ক'দিন আগে তো তারা বলেই ফেলেছে, 'আমরা এদেশে সেক্যুলার জনগোষ্ঠি তৈরী করতে চাই।' হ্যাঁ একেবারে খোলাখুলি বলে দিয়েছে।

শুনেছি টেলিভিশনে, নাটক-সিনেমায় যত বাটপার আর চোর-ডাকাতের ছবি দেখানো হয়, সব নাকি দেখানো হয় দাড়ি-টুপিওয়ালা হুযূরদের সুরতে। হুযূরের সুরতে রাজাকার বানিয়ে তার উপর জুতা মারা হয়। অথচ ইতিহাস খুঁজে দেখুন, রাজাকারদের মধ্যে সর্বোচ্চ হয়তো পাঁচ ভাগ ছিল দাড়ি-টুপিধারী গ্রাম্য মাতব্বর, তারা কেউ আলেম ছিল না। আর বাকি ৯৫ ভাগ রাজাকারই ছিল দাড়ি-টুপি বিহীন। তা সত্ত্বেও যত আক্রমণ সব উলামায়ে কেরামের ওপর। আল্লাহর পানাহ! এভাবে নতুন প্রজন্মের কাছে উলামায়ে কেরামকে চোর-ডাকাত ও রাজাকাররূপে পেশ করা হচ্ছে, যেন মানুষ উলামায়ে কেরামকে তুচ্ছ জ্ঞান করে, তাদের কাছে না যায় এবং তাদের শিক্ষা গ্রহণ না করে; এটা সম্পূর্ণ পূর্বপরিকল্পিত এক নীল নকশা। এটা জনগণকে উলামায়ে কেরাম থেকে বিচ্ছিন্ন করার গভীর ষড়যন্ত্র।

গত ১৭ই জানুয়ারি ২০১৬ ইং রবিবার দৈনিক ইনকিলাবের শেষ পাতায় সংবাদ ছেপেছে, এক নাস্তিক মন্ত্রী দেশবাসীকে দাওয়াত দিচ্ছে যে, আমাদের সংবিধানে সমাজতন্ত্র লেখা আছে, এটা সংবিধানের পাতায় থাকলে হবে না; সমাজতন্ত্রকে জীবনের পাতায় আনতে হবে!

এতে কী বোঝা গেল? সমাজতন্ত্রকে জীবনের পাতায় আনার মানে তো সকলের নাস্তিক হয়ে যাওয়া। এদের এ দাওয়াত কী ধর্মপ্রাণ মুসলমান কখনো মেনে নিবে এবং এর দ্বারা কী সকারের ভাবমুর্তি ক্ষুন্ন হচ্ছে না? জনগণের অসন্তোষ বাড়ছে না! আল্লাহ না করুন; নাস্তিকদের সিলেবাস ও তাদের দাওয়াত এভাবে চলতে থাকলে আমার আশঙ্কা, তাদের শিক্ষা সিলেবাসের বদৌলতে আগামী দশ বছরে আমাদের সন্তানেরা বর্তমানের চার আনা থেকে উত্তীর্ণ হয়ে বারো আনা নাস্তিকে পরিণত হবে। উলামাদের মেহনত ও তাবলীগের কারণে বাকী চার আনা ঠিক থাকতে পারে। ভেবে

দেখুন, দেশের বারো আনা শিক্ষিত লোক যখন নাস্তিক হবে তখন মুসলমানদের সোনার বাংলাদেশে সমাজতন্ত্রের ঘোষণা আসতে আর কোন বাধা অবশিষ্ট থাকবে? আল্লাহ তা'আলা হেফাযত করুন। নাস্তিকদের মেহনত ছাড়াও এদেশে শতাধিক লাইনে ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করার প্রচেষ্টা চলছে। সে সব বাতিলের মুখোশ উন্মোচন সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। এ ক্ষুদ্র পরিসরে তা সম্ভব নয়।

অদূর ভবিষ্যতে ধ্বংসাত্মক সমস্যার একমাত্র সমাধান!

এজন্য বর্তমানের উলামা ও সুলাহায়ে কেরামকে একযোগে দাওয়াতুল হক ও দাওয়াতে তাবলীগের মাধ্যমে দীনের দাওয়াত ও সুন্নাতের তা'লীম নিয়ে ময়দানে অবতীর্ণ হতে হবে। ইনশাআল্লাহ আমরা আমাদের দায়িত্ব-কর্তব্য ঠিকঠাক মত আদায় করলে নাস্তিক ও অন্যান্য বাতিলের দল কোন সুযোগ পাবে না, আল্লাহর রহমতে সব ভেসে যাবে। কারণ দাঈর সঙ্গে স্বয়ং আল্লাহ তা'আলার মদদ থাকে। এটাই কারণ যে, দাঈর সঙ্গে মোকাবেলা করে কেউ টিকতে পারে না, জিততে পারে না। বিজয় শেষ পর্যন্ত দাঈরই হয়! (সহীহ বুখারী; হা.নং ৭৩১১)

আল্লাহ তা'আলা আমাদের সবাইকে, প্রত্যেকের আওলাদকে দীনের খেদমতের জন্য কবুল করুন এবং মাদরাসা-মসজিদগুলো সুন্নী বানিয়ে এগুলোসহ দীনের সকল মারকাযগুলোকে হেফাযত করুন। আমীন ॥

সমাপ্ত